International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

অন্ত্যজ ও আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী রচিত ছোটগল্পের প্রভাব

সুকন্যা পাল

প্রাক্তন ছাত্রী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপঃ

মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যের এক অনন্য প্রতিভা, যাঁর লেখনী শোষিত, প্রান্তিক, ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনের বাস্তবতাকে জাগ্রত করেছে। বাংলা সাহিত্যে বিষয়ের বহুমাত্রিকতা ও দেশজ আখ্যানের অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন মহাশ্বেতা দেবী। প্রতিবাদী জীবন ও সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ঘরানার লেখিকা তিনি। তিনি শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, বরং মানবাধিকার আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জায়গায় বাংলা সাহিত্যের চরিত্র হিসেবে প্রকাশ করল জেলে, বাগদী, ডোম, মুন্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, শবর প্রভৃতি সম্প্রদায়। সাম্প্রতিককালে বাংলা কথা সাহিত্যে অসংখ্য ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকারেরা অন্ত্যজ ও আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনকে অবলম্বন করে বহু বিচিত্র ও নব নব রূপায়নে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহাশ্বেতা দেবী। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলি অন্ত্যজ ও আদিবাসী বিশেষত লোধা, শবর, জেলে, বাগদী, ডোম, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি গোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা শোষণ ও বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করেছেন তাঁর সাহিত্যিক সক্রিয়তা। তাঁর অমর রচনাগুলো যেমন ‘অরণ্যের অধিকার,’ ‘হাজার চুরাশির মা,’ এবং ‘রুদালী’ শোষণ, প্রতিবাদ এবং সংগ্রামের অমোঘ দলিল। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য নারীর শোষণ, আদিবাসীদের সংগ্রাম, এবং নিম্নবর্গীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে বাঙালি জাতির মধ্যে নবজাগরণের আলো জ্বালিয়েছে। তাঁর লেখনী সমাজ, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের গভীর বোধকে ধারণ করে একটি চিরকালীন মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করেছে। আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করে, রাষ্ট্র ও সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্পগুলিতে শুধুমাত্র আদিবাসীদের যুগ যুগান্তরের অধিকারের জন্য সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয় নি, সেইসঙ্গে অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির যথাযথ পরিচয়ও দান করা হয়েছে। 'দ্রৌপদী' বা 'ধৌলী'র মতো গল্পে তিনি আদিবাসী নারীদের সামাজিক ও শারীরিক শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে এই নারীরা যে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার হতে পারে, তা তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠে। মহাশ্বেতা দেবী কেবল কলম ধরেননি, বাস্তবেই আদিবাসীদের শিক্ষার আলোয় আনতে কাজ করেছেন। তাঁর গল্পের চরিত্ররা (যেমন 'রুদালী'র শনিচরি) নিজেদের লড়াইয়ের মাধ্যমে শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, যা আদিবাসী সমাজকে নিজস্ব প্রতিবাদ গড়ে তোলার সাহস জোগায়। সংক্ষেপে, মহাশ্বেতা দেবীর গল্প আদিবাসী ও অন্ত্যজ গোষ্ঠীকে তাদের ‘নিজেদের কণ্ঠস্বর’ শুনতে এবং অধিকার ছিনিয়ে নিতে শিখিয়েছে, যা শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করেছে।

সূচকশব্দঃ অন্ত্যজ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, সামাজিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতিবাদ, শোষণ, সামাজিক নীতি

ভূমিকাঃ

আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পের সাহিত্যশৈলী নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের হাতেই বিকাশ লাভ করে। রবীন্দ্র যুগে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একাধিক ছোটগল্পে এবং শরৎচন্দ্রের গল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিখুঁত চিত্র মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁদের রচনায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন কথা একান্ত বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে তাঁরা হলেন বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যে যেসব লেখকদের হাতে অন্ত্যজ ও আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, জীবনচর্চা তথা জীবনযন্ত্রণা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে রূপলাভ করেছে তাঁরা হলেন বনফুল, সমরেশ বসু, সুবোধ ঘোষ, বিমল সিংহ, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু ও মহাশ্বেতা দেবী প্রভৃতি। অবশ্যই সব লেখকদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট হলেন মহাশ্বেতা দেবী। লেখিকার আদিবাসী জীবনভিত্তিক অনেক গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহাশ্বেতা দেবী একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর সাহিত্য মানবতার প্রতি দায়বদ্ধতা ও সমাজের শোষিত শ্রেণির প্রতি গভীর সহমর্মিতার প্রতিচ্ছবি। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম, নারীর শোষণ, এবং নিম্নবর্গের প্রতি সমাজের অমানবিক আচরণ নিয়ে লেখা তাঁর রচনাগুলো শুধু সাহিত্য নয়, বরং ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক নতুন দৃষ্টিকোণ। ষাটের দশকের রাজনৈতিকসামাজিক পরিবর্তনের- প্রভাব তাঁর লেখায় স্পষ্ট, যা বাংলা কথাসাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এক বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর শবর, খেড়িয়া, বিরহড়, সাঁওতাল, ডোম, মুন্ডা, ওঁরাও ইত্যাদি সম্প্রদায়কে ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। যে আদিবাসী সমাজকে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় যাবতীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, সেই মানুষেরাই মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যের মূল অবলম্বন। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ছোটগল্পে অন্ত্যজ শ্রেনীর কথা, আদিবাসী শ্রেনীর কথা এবং তাদের জীবন সংগ্রামের কথা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। দারিদ্র সীমারেখার নিচে মানুষের যন্ত্রণা মহাশ্বেতা দেবীকে দিনরাত দগ্ধ করেছিল। যে দেশে জমিও খাদ্যের জন্য মানুষের লড়াই সেই দেশ কোনদিন সুস্থ সবল সমাজের জন্ম দিতে পারে না। সেখানে সৃষ্টি হয় কেবল হতাশা ও পরাজয়ের গ্লানি। মহাশ্বেতা দেবী একজন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক হতে চান নি। তিনি গ্রামে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রাম বাংলার বঞ্চিত মানুষদের একজন হয়ে আদিবাসী গোষ্ঠীর বঞ্চনার উৎঘাটন করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী সমাজের ভয় ভীতি অনুশাসন কঠোর সমালোচনাকে উপেক্ষা করে সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, ভীল প্রভৃতি অবহেলিত আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামকে তার সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস ও ছোটগল্পের পাতায় পাতায় সমাজ চেতনার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর গল্পে সমাজের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর বিশেষ করে আদিবাসীদের প্রতি জমিদার মহাজন এবং শাসক শ্রেনীর যে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা প্রকৃতির বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র তাদের সমস্যার কথা বলেই ক্ষান্ত হন নি, তাদের সেই সমস্যার সমাধানের পথও নির্দেশ করেছেন। তাই তিনি তাঁর আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ ও চেতনাবোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে একজন সাহিত্যিক হয়েও তাদের কাছে যেন শিক্ষক রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনি তাদের সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের দিকটি তুলে ধরেছেন। তিনি অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চোখ দিয়ে জীবনকে দেখেছেন। তিনি এমন একজন বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বরেণ্য সাহিত্যিক শিক্ষা দরদী ও সমাজের প্রতি প্রগতিমূলক মনোভাব সম্পন্ন লেখিকার অন্ত্যজ ও আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রয়েছে।

অন্ত্যজ ও আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নঃ

সমাজ শুধুমাত্র কতগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তির সমবায় গঠিত নয়। সমাজের মধ্যে আছে এক বৃহৎ শ্রেণী যারা শোষিত, নিপীড়িত এবং অত্যাচারিত। সুশিক্ষায় পারে একটি সুন্দর সমাজের জন্ম দিতে। শিক্ষা হল সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবার সমাজের আঙ্গিনায় সাহিত্যের বিস্তৃতি। শোষিত, নিপীড়িত মানুষের মুখে দিতে হবে ভাষা এবং তাদের মধ্যে অনাবিল আশা জাগিয়ে তুলতে হবে। মহাশ্বেতা দেবী নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত ও বঞ্চিত ভারতবর্ষের আদিমতম বাসিন্দা আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার বিকাশ ঘটিয়ে আধুনিকতার স্পর্শে তাদেরকে উজ্জীবিত করে। সমাজের প্রান্ত দেশ থেকে তুলে আনার জন্য সমগ্র সাহিত্য জীবনটাকে তিনি উৎসর্গ করেছেন। আদিবাসীদের বঞ্চনার শোষণের মূলে যারা রয়েছেন তাদের প্রকৃত চেহারার উন্মোচনের জন্য মহাশ্বেতা দেবী কলম ধারণ করেছিলেন। তিনি প্রায় তাঁর প্রত্যেকটি গল্প উপন্যাসে আদিবাসীদের জাগরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার ফল স্বরূপ আমরা আদিবাসী পুরুষ ও নারীদের শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে দেখি। ভারতবর্ষের মতো দেশের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী যুগে অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের অবস্থা যে রূপ ছিল স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও তাদের অবস্থা আশানুরূপ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নি। শুধু ভারতবর্ষ নয় বিশ্বের সর্বত্রই দেখি আদিমতম উপজাতিরা সর্বক্ষেত্রে আজও উপেক্ষার বস্তু। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সৃষ্ট কথা সাহিত্যে সেই দিকটি খুব ভালো ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি উপলব্ধি করলেন তাদের এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি তাদেরকে এগিয়ে আসার জন্য প্রেরণার সঞ্চার করে। শিক্ষার মাধ্যমে তাদের এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে বলে তিনি মনে করলেন। তাদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। সে শিক্ষা তাদের মধ্যে প্রতিবাদী সত্ত্বার বিকাশ ঘটিয়ে সচেতনতার জাগরণ ঘটাবে সেই শিক্ষায় তাদেরকে স্বশিক্ষিত হতে হবে। এই শিক্ষা তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটাবে এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে সভ্য সমাজে উত্তীর্ণ করবে। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলিতে শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম বিকাশের পাশাপাশি প্রতিবাদী সত্ত্বার দিকগুলিও লক্ষ্য করা যায়।

গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশঃ

মহাশ্বেতা দেবী একজন গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিল্পী সাহিত্যিক। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলিতে সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটানো হয়েছে। লেখিকার বেশিরভাগ গল্পগুলির মধ্যেই আমরা প্রচ্ছন্নভাবে ও প্রকটভাবে রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করি। এই চেতনার বিকাশের দিন থেকেই আমরা বুঝতে পারি আদিবাসীরা রাজনীতির আস্থাশীল হয়। **'ভাতুয়া'** গল্পে পবনের বউ তার ছেলে ভগীরথকে অন্য কোন স্কুলে ভর্তি না করে অধরবাবুর স্কুলে ভর্তি করেন। কারণ অধরবাবু নকশাল আন্দোলনের নেতা। 'ভাতুয়া' গল্পে আদিবাসী সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক চেতনা যে জাগ্রত হয়েছে তার চিত্র পাই এই গল্পের পবন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। যাদেরকে এতদিন দেশের আইন-কানুন সম্বন্ধে উদাসীন করে রাখা হয়েছিল। আজকে তারাই আজকে আইনের সন্ধান করে। সে আইন তাদের ভাতুয়াতাকে মুক্তি দিতে পারে। তাইতো পবন একশাল আন্দোলনের নেতা অধর বাবুকে বলে-

"ভাতুয়াটো গুলামটো করি দিচ্ছে বাপ, ভাতুয়া জীবন হতে বাহার করি আনতি তুমি
ভি পার না গা অধরবাবু। এত আইন দেখতেছ, ভাতুয়ার তরে কুচনা আইন নাই"।

মহাশ্বেতা দেবীর আরেকটি গল্পে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশ দেখতে পায়। এই চেতনার উদ্বুদ্ধ হয়েই সিধু কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। যার চিত্র আমরা দেখতে পাই লেখিকার 'হুলমাহার' ছোটগল্পে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর এই গল্পগুলির

মাধ্যমে অন্ত্যজ ও আদিবাসী সমাজে আদিবাসীদের গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের নিজেদের সমাজের উন্নয়ন ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

সামাজিক নীতি নির্ধারণঃ

মহাশ্বেতা দেবী তার আদিবাসী সমাজ সংক্রান্ত গল্পগুলিতে আদিবাসীদের শিক্ষিত করে তোলার কথা বলেছেন। তিনি তাদেরকে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সেই শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। যে শিক্ষা আদিবাসীদের বাঁচার মতো বাঁচতে শেখাবে এবং যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা সমাজের নীতি নির্ধারণ করবে সেই শিক্ষায় দিতে বলেছেন লেখিকা। সেরকম দৃষ্টান্ত পায় আমরা **'ঘন্টাবাজে'** গল্পে। লেখাপড়া জানা লোক সাঁওতাল সমাজে এসে তাদের জীবনকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। লেখিকা সেই অসাধারণ কাহিনীর দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। নদীতে বাণ আসলে, বর্ষার জল নামলে এই ঘন্টা বাজিয়ে মানুষকে সাবধান করে দিত। আদিবাসী তরুণ ছেলে সুবল সে একমাত্র ঘন্টা সম্বন্ধে জানে। সে পড়াশোনাও জানে। আদিবাসীরা সবাই মিলে লেখাপড়া শিখছে এবং নানা কাজ করছে। তারা শিক্ষিত হয়ে অনেক কিছু ঠিক করে যেমন কন্যাপণ সর্বাধিক বারো টাকা, পাত্র-পাত্রী দেখতে তিন থেকে পাঁচজনের বেশি লোক যাবে না। বিধবা মেয়ের ক্ষেত্রে পন ছয় টাকা নেওয়া হবে এবং সবাই মিলে ঠিক করে ক্ষেত মজুরি তিন টাকা দশ পয়সা রোজ হিসাবে নেবে।

প্রতিবাদী সত্ত্বার বিকাশঃ

মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের মধ্যে প্রতিবাদী রূপ দেখাতে চেয়েছেন। নিপীড়িত, বঞ্চিত ও শোষিত আদিবাসী সম্প্রদায় এবং নারীদের প্রতিবাদী হতে বলেছেন। আদিবাসীদের অভিভাবক হয়ে প্রতিবাদী সত্ত্বার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি দান করতে হবে সেটি লেখিকা মর্ম মর্মে অনুভব করেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলির মধ্যে বিশেষত্বের দাবিদার **'বাঁয়েন'** গল্পটি। এই গল্পে মূল বিষয় আবর্তিত হয়েছে চন্ডী নামক এক নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এই চন্ডীই এই গল্পে বাঁয়েন নামে পরিচিত। সে জাতিতে ডোম। এই চন্ডী নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে গ্রামের মানুষদের বাঁচালো। এই গল্পের কাহিনীকে লেখিকা শুরু করেছেন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দিয়ে। আলোচ্য গল্পে লেখিকা সমাজ সচেতন মন বাস্তবতার পরিপন্থী। নারীর প্রতি অন্ধ কুসংস্কারে জরাজীর্ণ সমাজের ও তার প্রতি বিভেদমূলক আচরণের প্রভাব এই গল্পে লক্ষ্য করা যায়। অত্যাচার ও নিপীড়নের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কঠোর লড়াই করে বাঁচতে হবে এমন বার্তা দিয়ে তিনি স্বাধীকার বোধের সঞ্চার করতে চেয়েছেন। যখন চন্ডীকে বাঁয়েন বলা হয় তখন তাকে সমাজ, স্বামী, সন্তান ও পরিবার থেকে বিচ্যুত করে সমাজের এককোণে এবং একঘরে করে রেখে দেয়। নিয়ম, শাসন ও শৃঙ্খলের বেড়ি তার পারে পড়িয়ে দেওয়া হয়। সে প্রতিবাদী হতে চাই-

"একদিন একটা ফর্সা মেয়ে, কটা চোখ, লালচে চুল, এসে দাঁড়িয়েছিল।
বলেছিল—আমি চণ্ডী, অমুক গঙ্গাপুত্তের বিটি, বাপ মরে গেল। বাপের ডালা এখন মোকে দেন।
—বাপের কাজ তুই করবি?
—করব।
তোকে ভয় লাগে না?
মোর ভয় ডর নাই।"

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কুসংস্কার, লিঙ্গ বৈষম্য এবং প্রান্তিক মানুষের যন্ত্রণার চিত্র গল্পটিতে ফুটে উঠেছে।

'দ্রৌপদী' গল্পটি মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী গল্প। সভ্যজগৎ ও তাদের নির্মিত আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেনী শোষণের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশের মধ্য দিয়ে গল্পটির আঙ্গিক বিন্যস্ত হয়েছে। গল্পের মূল কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র দ্রৌপদী, অনার্য ও সাঁওতাল উপজাতির বিদ্রোহের প্রতিনীধি। মহাজন কারবারী ও শোষক শ্রেণীর প্রতিনীধি সূর্য শাহু তার ছেলেকে খুন করার অপরাধে সমস্ত পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও বিশেষ করে পুলিশ অর্জন সিং-এর কাছে দৌপদী মাঝেন ও তার স্বামী দুলন মোষ্ট ওয়ান্টেড। ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন অর্জন সিং-এর প্রতিনিধিত্ব যৌথ বাহিনীর 'বাকুলি অপারেশনে' পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল দ্রৌপদী ও তার স্বামী। পরবর্তীতে দুখীরাম ঘড়ারীর বিশ্বাসঘাতকতায় স্বামী দুলনের পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হলেও দ্রৌপদী একাই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। প্রলোভনের পথে পা দিয়ে একাই জাতির ও সংগ্রামের সহকর্মী সোমাই ও বধুনার বিশ্বাসঘাতকতায় দ্রৌপদী বেশি দিন আত্মগোপন করতে পারে না। একসময় তাকে পুলিশের জালে ধরা পড়তে হয়। এরপর সেনা নায়কের আদেশ মতো দ্রৌপদী উপর শুরু হয় অমানুষিক ও অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ। কারণ সেনা নায়কের কঠোর নির্দেশ 'ওকে বানিয়ে নিয়ে এসো। **'ডু দি নীড ফুল'।** দৌপদীকে সাধ্য মতো বানিয়ে নিয়ে আসে সেনাগণ-

"তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চন্দ্র বৎসর লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দৌপদী চোখ খুলে কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্ত আলপিনের মাথা সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দুহাত দু খুঁটোয় এবং দু পা দু খুঁটোয় বাঁধা"।

মহাভারতে পঞ্চপান্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীকে ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যসভায় দুঃশাসন বিবস্ত্র করেছিল। কিন্তু এই গল্পে দ্রৌপদীর জোতদার মহাজনী শোষক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আদিবাসীরূপ এক পার্থিব সত্তা। এক ঘন্টা ধরে অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষিত হবার পরেও বিদ্রোহী চেতনায় ভাস্বর দ্রৌপদীকে কিছুতেই দমিয়ে রাখা যায় না। উলঙ্গ ধর্ষিত দ্রৌপদী আরও বীভৎস হয়ে ওঠে সেনা নায়কের কাছে। দ্রৌপদীর নিরস্ত্র প্রতিবাদের সামনে সেনানায়ক পর্যন্ত ভীতস্ত।

"দ্রৌপদীর কালো শরীর আরো কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনা নায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে ..... কাপড় মোরে পরতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাউটার কর লেঃ কাউটার কর? দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনা নায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনা নায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, এবং ভীষণ ভয়"।

প্রতিবাদ যদি সবাক কিংবা অবাক অথবা সোচ্চার কিংবা নিরুচ্চার যাই হোক না কেন কায়েমী শাসকদলের কাছে তা অবশ্য মারাত্মক ভয়ের বস্তু। প্রতিবাদেই নির্মূল হয় শোষণ এবং শোষকের শোষণ ক্ষমতার সিংহাসন যায় টলে। যে উলঙ্গ সোচ্চার প্রতিবাদ এই গল্পে দ্রৌপদী নামক আদিবাসী এক রমণী চরিত্রে লেখিকা তুলে ধরেছেন তা অভাবনীয়।

'দ্রৌপদী' গল্পের মতো মহাশ্বেতা দেবীর **'শিকার'** গল্পেও আমরা পাই ওঁরাও আদিবাসী উপজাতি মেরী নামক নারী চরিত্রটিকে যে কিনা সোচ্চার প্রতিবাদে প্রতিভূত। অবশ্যই এই গল্পের বিষয়বস্তু ও প্রেক্ষাপট আলাদা। কিন্তু থিম একই। অস্ট্রেলিয়ান সাহেবের ঔরসে জাত মেরীকে ওঁরাও সমাজ তাদের রীতিনীতি থেকে যেমন অব্যবহতি দিয়েছে ঠিক তেমনি মেরীও সমাজের রীতিনীতিকে তোয়াক্কা করে না। ঠিকাদার তসিলদার সিং একজন বিবাহিত পুরুষ হওয়া সত্বেও সে নারী দেহ লোভী এক মাংস লোলুপ পশু। যে কোন মূল্যেই মেরীর সাথে সে দেহ সম্ভোগ করতে চায়। সেই লক্ষ্যকে পূরণ করার উদ্দেশ্যে প্রথম দিকে মেরীকে বস্তুগত প্রলোভন

দেখায়। কিন্তু মেরীর বলিষ্ঠ ও তেজী মনোভাব তহশীলদার সিং-এর সুবিধা করতে পারে না। এখানেই লেখিকা এই গল্পের পরিসমাপ্তি টেনে দিতে পারত কিন্তু লেখিকা তা করেন নি। উচ্চবিত্ত সমাজের সম্ভোগ লিপ্সু পুরুষেরা প্রান্তীয় সমাজের নারীদের শারীরিক চাহিদা মেটাবার জন্য বেশিরভাগ সময় ব্যবহার করেন। মেরীর ওপরেও এমন কুদৃষ্টি পড়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে আমরা মেরীকে প্রতিস্পর্ধী রূপে আবিস্কার করি-

"তসিলদার তাঁবুতে বসে মেয়ে মরদকে পয়সা দিচ্ছিল। প্রচুর মানুষের ভীড়। তারই মধ্যে মেরী ঢুকে পড়ে ও জঘন্য গাল দিয়ে..... ফের বদমাশি করবি তো নাক কেটে নেব। হাত দুলিয়ে ও বেরিয়ে যায় সগর্বে।"

বারো বছর পরে ওঁরাও সমাজে আজ পুরুষদের পরিবর্তে মেয়েদের শিকারের দিন। এই দিনের রাত্রিতেই তহশীলদারের প্রতীক্ষিত স্থানে অভিসার করতে চেয়েছেন। এই গল্পের শেষে দেখতে পায় মেরীর দা-এর কোঁপে তসিলদারকে নিধন হতে হয়েছে। মাংস লোলুপ মানুষ বেশধারী পশু তসিলদারের নিধনকে মেরীর মনে হয় বড় শিকার।

"কয়েক লক্ষ চাঁদ কাটল। মেরী উঠে দাঁড়ালো। রক্ত? জামায়? কাপড়? নালায় ধুয়ে নেবে ..... নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করত ওর ঘুম গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল। যেন পুরুষাঙ্গ করে অশেষ তৃপ্তি পেয়েছে ও"।

নারীর জাতির প্রতি অবমাননা ও মাংস লোলুপ পুরুষবেশী পশুর প্রতি মেরীর এই সশস্ত্র প্রতিবাদ অবশ্যই আইনের চোখে অপরাধ। কিন্তু জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে প্রতিবাদের স্থান অবশ্যই রয়েছে তা সে নিরুচ্চার প্রতিবাদেই হোক কিংবা সোচ্চার। শুধু তাই নয় সেই শিকার নিধন রাত্রিতেই ওঁরাও সমাজে মেয়েদের গানের ভাষা অলক্ষ্যে উঠে এসেছে যুগ পরবর্তী যুগান্তর প্রতিবাদের সংকেত-

"হে হরম্‌দে ও
এমনি হোলি বছর বছর হোক-
এমনি শিকার বছর করি-
মদ দিব তোমাকে
মদ দিব"।

'দ্রৌপদী' ও **'শিকার'** গল্পে কেন্দ্রীয় দুই আদিবাসী নারী চরিত্র দ্রৌপদী ও মেরীর মধ্যে সোচ্চার ও সশস্ত্র প্রতিবাদ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট অন্ত্যজ নারী চরিত্রের মধ্যে এই মেরীকে সামনের সারিতেই রাখা যায়।

'ধৌলী' গল্পে দেখতে পায় উচ্চ বর্ণের হিংসা ও তার ফলে অন্ত্যজ দুসাদ শ্রেনীর এক নারীর সংকটময় জীবন কাহিনীকে। যেখানে রয়েছে বিশ্বাস, অবিশ্বাস প্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার নিদারুণ চিত্র, মেরীর মতো তীব্র প্রতিশোধকামী চরিত্র হলে ধৌলী। সে প্রতিশোধ নিতে পারত। সে জানে তার শরীরই তার শত্রু। বর মারা গেলে ধৌলীর দিকে নজর পড়ে তার ভাশুরের। ধরা পড়ে ব্রাহ্মণ সন্তান মিশ্রিলালের প্রেমে। মিশ্রিলাল ধৌলির পেটে তার উত্তরাধিকার রেখে পালিয়ে যায়। ধৌলী পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। মিশ্রিলাল প্রথম দিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে সে উচ্চবর্ণের আর পাঁচ জন শান্ত ভালো ছেলের মতো ছিল। মিশ্রিলাল ধানবাদে চলে গেলে অন্তঃসত্ত্বা ধৌলীর জীবনে অস্তিত্বের সংকট ঘণীভূত হয়। ধৌলী সবই জানছিল ও প্রতিবাদ জানাবার কথা ভুলেও ভাবে নি।

"দুসাদ মেয়েকে ব্রাহ্মণের ছেলে কি এই প্রথম নষ্ট করল? গ্রাম সমাজের বিচারে সব দোষ ধৌলীর"।

প্রতিবাদী সত্ত্বার বিকাশে আরো এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত **'রুদালী'** গল্প। গল্পের নায়িকা শনিচরী। পেশায় রুদালী অর্থাৎ ভাড়াটে কাঁদুনী। টাকার বিনিময়ে কান্নাকাটি করে মৃতের সংস্কার সংক্রান্ত নানা ধরনের কাজও করতে হয়। রুদালী চরিত্রের মাধ্যমে আদিবাসী নারী চরিত্রের মধ্যে প্রতিবাদী সত্ত্বার জাগরণ ঘটিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী। যুগ পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজ সভ্যতায় এসেছে পরিবর্তন। নিজের আত্মীয়-পরিজন মারা গেলে শনিচরীর কান্না করার অবকাশ পায় নিঃ

"শাশুড়ি মরতে শনিচরী কাঁদে নি। ওর বর আর ভাশুর, শাশুড়ির দুই ছেলেকেই হাজতে পুরেছিল মালিক-মহাজন-রামাবতার সিং। বুড়িকে দাহ করার ব্যবস্থা করতে শনিচরী এত ব্যস্ত ছিল যে কাঁদার সময় হয় নি। হয় নি তো হয় নি! বুড়ি যে জ্বালান জ্বালিয়ে গেছে, কাঁদলেও তো শনিচরীর আঁচল ভিজত না"।

আসলে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পে প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েই সবকিছু থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যে সম্ভব সেটাই দেখিয়েছেন।

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্তিঃ

অন্ধ কুসংস্কারই সমাজে কোন জাতির উন্নয়নের বাঁধা। আমাদের দেশে আদিবাসীদের মধ্যেও নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এরকমই একটি বড় কুসংস্কার ডাইনি প্রথা। সর্পাঘাত, ভয়ঙ্কর রোগ ব্যাধি হলে তারা ঝাড় ফুঁক, জলপড়া, নুনপড়া প্রভৃতি। এর ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের বলি হয়। মহাশ্বেতা দেবীর **'ডাইনি'** গল্পটিতে এরকমই একটি ডাইনি প্রথার ভয়ংকর রূপ আমরা দেখতে পায়। মূলত মহাশ্বেতা দেবীর **'ডাইনি'** গল্পে আদিবাসী সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের অন্ধ সংস্কার তুলে ধরা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস কোনো মানুষের উপর প্রেত বা পিশাচ ভর করলে তারা ডাইনি হয়ে যায়। এ গল্পে ডাইনির ক্ষমতা দেখানো হয়েছে। তাদের প্রভাবে আকাল আসে, খরা হয়, মড়ক দেখা দেয়। নিম্নবর্গের সমাজে প্রভুত্বশক্তি হনুমান মিশ্র ব্রাহ্মণ, তাদের ভাষায় 'বরাম্ভোন দেবতা'। সে নিজের পুত্রের অপকর্মের দায় চাপিয়ে দেয় গঞ্জু, দোসাব, ধোবী, ওরাওঁ এবং মুণ্ডাদের ওপর। প্রচার করে যে ডাইনির আবির্ভাব হয়েছে তাদের পাপাচারের কারণে। এই ব্রাহ্মণের অপপ্রচারে নিম্নবর্ণের জীবনে পারস্পরিক অবিশ্বাস দানা বেধে ওঠে। নিজেদের মধ্যে ডাইনি খোঁজা শুরু হয়। এই সমাজে ডাইনি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হলো — ডাইনি দূর থেকে নজর দিয়ে বা তুক করে দুধে দই কাটায়, ছাগলগাই মেরে ফেলে-; শস্য নষ্ট করে, খরা ডাকে আকাল ঘটায়, ছোট ছেলেপিলের প্রাণ নেয়, রজস্বলা মেয়েকে স্বদলে টানে, গর্ভিনীর গর্ভে ঢোকে। এসব কারণে সেই সমাজ থেকে ডাইনিকে তাড়িয়ে দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। প্রকৃত ঘটনা গল্পের শেষে উন্মোচিত হয়েছে। টুরার পহানের মেয়ে সোমরিই ডাইনি বলে মিথ্যা অভিযুক্ত হয়েছে হনুমান মিশ্র কর্তৃক। তারই নিকৃষ্ট অপকৌশলে বোবা সোমরিই ডাইনি বলে বিতাড়িত হয়েছে। অসহায় সোমরিইকে গর্ভবতী করেছে হনুমানের ছেলে। তারপর তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে জঙ্গলে। আর ডাইনির মিথ্যা কাহিনি ছড়িয়ে সহজ সরল কুসংস্কারগ্রস্ত গ্রামবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। হনুমান মিশ্ররা নিজেদের অপরাধ আড়াল করার জন্য নারীসমাজকে এভাবে নিন্দিত করে তোলে। গ্রামবাসীরা শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সত্য জানতে পেরে মিশ্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। গঞ্জু, দোসাব, ধোবী ও মুণ্ডদের এই পরিবর্তন এ গল্পের মুখ্য ব্যঞ্জনা।

"শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা ডাইনির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। ডাইনির অসত্যতা বিষয়ে এদের সম্যক উপলব্ধি হয়। মিশ্রজীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে। গঞ্জু, দুসাব, ধোবী ও মুন্ডাদের এ ধরনের পদক্ষেপে সমাজ

পরিবর্তনের এক ক্ষীণতম আশার সঞ্চার হয়।"

ডাইনি' গল্পে আদিবাসীদের নির্মম শোষণের চিত্র রয়েছে। ডাইনির আবির্ভাব মূলে রয়েছে ওদের পাপ। নিজেদের মধ্যেই ডাইনি খুঁজতে শুরু করে দেয়। তারা কাহিনীটি এমনভাবে প্রসারিত হয়। হনুমান মিশ্র টুরা, করুডা, হেসাডি গ্রামে ডাইনির আবির্ভাব ঘটেছে সে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সাবধানী বাণী ঘোষণা করে, এবার যেন ডাইনিকে হত্যা করা না হয়। এবার যেন পাতর মেরে বা আগুন ছড়িয়ে ডাইনিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা নানাভাবে ডাইনিকে কুরুডা থেকেই মুরুহাই থেকে হেসাডি থেকে জিলাদের মাঠে তাড়িয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই ডাইনি প্রথা থেকে মুক্ত হওয়ার পথও নির্দেশ করে দিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী।

মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য আদিবাসী সমাজকেন্দ্রিক গল্পগুলির মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন এবং অনুভব করিয়েছেন যে আজকের দিনে অন্তজ আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ সমাজে আর উপেক্ষিত নয় তারাও সভ্য সমাজের বাসিন্দা। তারাও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাই এবং শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে তাদের সমাজব্যবস্থাকে উজ্জ্বল করে তোলে। মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ ও আদিবাসী জীবনভিত্তিক গল্পগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, লেখিকা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসীদের জীবন ও সমস্যার ছবি তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মানুষ হয়েও কিভাবে জোতদার, মহাজন, পুলিশ ও প্রশাসনের নানা ধরনের অত্যাচারিত শোষকরা দীর্ঘকাল ধরে সহজ সরল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে এসেছে। আজকের উদীয়মান সভ্যতার ভিত্তিভূমি হল এই আদিবাসী সম্প্রদায়। এদেরকে সঙ্গে নিয়ে লেখিকা শিক্ষিত পাঠক সমাজকে এদের উন্নয়নে এগিয়ে যেতে বলেছেন। তাই মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী জীবনকেন্দ্রীক গল্পগুল শুধুই গল্প হয়েই ওঠেনি হয়ে উঠেছে অন্ত্যজ ও আদিবাসী সম্প্রদায় জনগণের এক সত্য বাস্তব দলিল। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জনসমাজের গভীর প্রবেশ করে তাদের দৈনন্দিন জীবনচারণকে অনুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে দর্শক সমাজে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন সাহিত্য পত্র পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে উপজাতি আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষের এবং নারীদের ওপর শোষণ ও বঞ্চনার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। তার সৃষ্ট সাহিত্যে কাহিনী নির্মাণে, চরিত্র অঙ্কনে ও সমাজ বাস্তবতার রূপ চিত্রণে তাঁর ক্ষুরধার রচনা ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবী পাঠকের বিনোদনের জন্য গল্প রচনা করেন নি, তাঁর গল্পে রয়েছে শুধু প্রতিবাদী ভাষা, প্রতিবাদী রং। তাই মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য প্রতিভা তথা তার সাহিত্য সৃষ্টির মৌলিকতা বা নিজস্বতার কথা বলতে গিয়ে অশোক দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন-

"রূপকথার জগৎ নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি নতুন স্বর, নতুন একটি ভাষাই তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। আর আশ্চর্য, সেই স্বর নাগরিক সমাজের সাহিত্যবোদ্ধা ও পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যও হয়ে উঠলো। সেই ভাষাকে মাটির ভাষা বলে গ্রহণ করতে কেউ দ্বিধা করল না। এককথায় বলা যায় মহাশ্বেতাদি ভারতীয় সাহিত্যে এক নতুন ভুবন তৈরি করলেন, যে ভুবনের কথা সেভাবে তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে আসেনি।"

গ্রন্থপঞ্জীঃ

1. ঘোষ, নির্মল, মহাশ্বেতা দেবীর অপরাজেয় মুখ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮।
2. চৌধুরী, ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৩।
3. দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র (১-৩), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১।
4. দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র (৪-৭), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২।
5. দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র (৮-১২), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।
6. দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র (১৩-১৫), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

7. দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র ১৬, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫।
8. দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবী গল্প সমগ্র -১, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১২।
9. দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবী গল্প সমগ্র -২, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১২।
10. দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবী গল্প সমগ্র -৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১৪।
11. দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর ৭৫ টি গল্প, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮।
12. দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা ১৩৫১।
13. মন্ডল, উৎপল, কামনা মজুমদার, মহাশ্বেতার গল্পঃ মহাশ্বেতার সন্ধানে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২।